# স্বপ্নের ঘুড়ি

রাজীব চট্টোপাধ্যায়



৭ ই মাঘ, সন্ধ্যা ঃ ছোটবেলা বাবা-মা দু'জনের মুখেই শুনতাম ভদ্রলোকের ছেলেরা ঘুড়ি ওড়ায় না, পুকুরে ছিপ্ ফেলে ম াছ ধরে না কিংবা গুলিও খেলে না । ওসব কাজ ছোটলোকেদের । বা একতরফা অধিকার-ই । বখাটে-মূর্খ ছেলেরাই করে ওসব । ঘুড়ি ওড়ায় সারাদিন । ভদ্রলোকের ছেলেদের লেখাপড়া করতে হয় শুধু । নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয় । ম ানুষ হতে হয় । খুব বড় মানুষ । 'মানুষ' শব্দটার যে অর্থ তখন কে জানত ! তাই সেই শব্দের বারংবার উচচারণেই কী দুর্বোধ্য করে তুলতাম নিজেকে ? আর তাই হয়ত আমার নিজস্ব অস্তিত্বটাই ফেঁসে গিয়েছিল এক সময় । স্রেফ ফেঁসে য াওয়া । নাকি ফাঁসিয়ে দিয়েছিল সেই শব্দই ? আমি বুঝতে পারিনা ! বাবা যখন গম্ভীরভাবে আমাকে কথাগুলো বলতেন বাবাকে বড় বেশী নিষ্ঠুর মনে হত । বা ওর চাইতেও বেশী কিছু । স্কুলের অঙ্কের স্যার প্রবোধবাবুর কথাই কি মনে পড়ত তখন ? মনে কর রাকা , বাবার এক একটা শব্দ গরম সীসের মতো বিঁধছে তোমাকে । তৈরী হয়ে যাচ্ছে গভীর ক্ষত । ক্ষতস্থান থেকে রক্তের অবাধ নিঃসরণ । সেই রক্তের রঙ তুমি দেখতে পাচ্ছো কি রাকা ? ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তোম ার ইচ্ছা । তোমার স্পৃহা । অভিপ্রায় । বা তুমি-ও । টুকরোগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে । ঝরে পড়ার সেই শব্দ । তুমি কি শুনতে পাচ্ছো রাকা ? তোমার শরীর জুড়ে যন্ত্রনা । অথচ ভীষন রকমের বোবা তুমি । তোমার বুকে একরাশ গোঙানি শুধু । তুমি কি কষ্ট পাচ্ছ খুব ?

আমাদের বাড়ির ঠিক পাশে কিছুটা ফাঁকা জমি ছিল তখন। ছোট একটা মাঠের মতো। ন্যাড়া। ঘাসহীন — ক্ষ। বর্ষায় ক াদার প্যাঁচ-প্যাঁচ। আমি খেলতাম সেখানে। বিকালে। আমার মতো অনেক। পল্টু, বাপন, রাজু .....। নামগুলো যেন মনে আসতে চাইল হঠাৎ করেই। হাফপ্যান্ট পরা কতগুলি মূর্তি। প্যান্টের তলায় স দুটো ঠ্যাঙের উপর দাঁড়িয়ে রাজু। ম ানে আমাদের বক-ধার্মিক। আর এই নামটাই কে দিয়েছিল যেন। আমরা খেলতাম। ক্রিকেট। ফুটবল। বা পিট্টু-ই। কয়েকটি চাক্তির মতো কিছু সাজিয়ে রাখা পরপর। একটার উপর একটা। আমাদের স্বপ্নের ইমারত। বল মেরে ভেঙ্গে দিল কেউ। সারা মাঠ জুড়ে ছোটাছুটি। বল গায়ে লাগলেই আউট। ভাঙ্গা চাক্তিগুলোকে সাজিয়ে ফেলা আবার। পি.....ট.....টু.....। চিৎকার করেই বলল রাজু। আমি দেখতে পাচ্ছি। ওর গলায় এত জোর? আমার চোখের সামনে যেন সেই অমসৃন প্রতিফলক। ফুটে ওঠা সিনেমা। সিনেমার এগিয়ে চলা। দৃশ্যের পিছনে দৃশ্য।

সরস্বতী পূজার দিন সকাল থেকে সেই ফাঁকা জায়গাটা ওড়াত অনেকে। সারাদিন। সেইসঙ্গে হৈ-হুল্লোড়। আগের দিন র াতে বাঁকা টাঙিয়ে হ্যাজাক জ্বালিয়ে মাঞ্জা দেওয়া সুতোয়। হাঁড়িতে মিশ্রণ। লাল সবুজ হলুদ। বাঁশ ঘিরে সুতোর অ াবর্তন। লাটাইয়ের পেটে ঢুকিয়ে দেওয়া ছোট পাথর। ঘূর্ণনে উঠে আসা শব্দ। টর্-টর্-টর্। অনেক রাত পর্যন্তই ওদের কথা কানে আসত আমার। ঘুম আসত না। ঘুমোতে চাইতামও না হয়ত। আমার পাশে মা। মায়ের ঘুমন্ত শরীর। অন্ধকারে ওদের কথা শুনতাম চোখ বুজে। বুঝতে পারতাম না অবশ্য। মাঝে মাঝে দু'একটা টুকরো কথা। আর সেই টুকরো কথ াগুলো জুড়েই বাক্যগুলো তৈরী করতাম আমি। মানে ওদের কথা—। তবুও সব কিছুই প্রায় ধোঁয়াটে। আমার শৈশব।

ছোটলোকের ছেলে হয়ে জন্মানোর কথাই কী তুমি ভাবতে? নাকি — ! হয়ত ভাবতে তুমি। অনেক কিছু করতে পাবার কথা। ওদের মতো ঘুড়ি ওড়াবার কথা বা মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবার কথা, এদিক-সেদিক। তুমি কী সত্যিই মুক্তি চাইতে রাক া? কিন্তু — কোথায়?

মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে আমি পারিনি। কারণ ছোটলোকের ছেলে নই আমি। তবে কী আমি 'ভদ্দরলোক'? একথা মানতে রাজী আছে কেউ? ঘুম এসে ভিড়েছে চোখে। ক্রমশ।

স্বপ্নটা মনে আছে এখনও। সেই ঘুড়ির স্বপ্ন। কোনো এক সরস্বতী পূজার আগের রাত আমার চোখে। আমার ক্লাস ফোর। বা ফাইভ-ই।

কিন্তু শুধু এই স্বপ্নটা বা তোমার মনে থাকল কেন? ভুলতে চাইলেও কী তুমি পারছ না? নাকি —! সিনেমার পর্দায় আলো ফুটছে ক্রমশ। তুমি দেখতে পাচ্ছ রাকা? সত্যিই কী তুমি —!

ফাঁকা জমিটার উপর আমি। একা। সমুদ্র ঘেরা দ্বীপে কোনো পলাতক। মাথার উপর ঘুরি প্রচুর। নানা রঙ। লাল-সাদা-কালো। একটা মস্ত লাটাই আমার হাতে। তাতে প্রচুর সুতো। আমার পঙ্খী ঘুড়ি উড়তে উড়তে চলে গেছে সূর্যের কাছে। ছোট্ট হয়ে গেছে একদম। কোনো বিন্দু। আর একটু সুতো ছড়ালেই হয়ত সূর্যের সঙ্গে ধাক্কা খাবে সেটা। হঠাৎ একটা লাল ঘুড়ি চলে এল সামনে। প্যাঁচ লেগে গেল। আমি সুতো টানতে লাগলাম। প্রাণপণে। কাটা খেল লাল ঘুড়ি। আমার হাতেই। চিৎকার করে উঠলাম ভো.... কা.... ট্টা। ঘুম ভেঙ্গে গেল। হঠাৎ-ই। চোখ মেলেই দেখি বাবা। আমার সামনে। অদ্ভুত ভাবেই দেখছেন আমাকে । আমার মুখ। জানালার ফাঁক গলে রোদ্দুর। শুয়ে থাকা। বিছানায়। আর আমার উপরেও। চিৎকারটা একটু জোরেই করে ফেলেছি হয়ত। কিন্তু আমার চিৎকার কী শুনতে পেয়েছেন বাবা? তাহলে কী—! ভয় পেলাম। হাসিও পেল হঠাৎ। আমি ঘুড়ি উড়িয়েছি। বাবা জানতেন না। বুঝতেও পারলেন না রাকা কত সহজেই কেটে দিয়েছে একটা লাল ঘুড়িকে!

রাকা, তুমি তাহলে ঘুড়ি উড়িয়েছ সত্যি? কিন্তু এতদিন পরেও কি তোমার মনে আছে সে কথা? কোন বিশেষ কারণ? বাবার মুখ দেখে তোমার সেদিনের হাসি আমি দেখেছি। অথচ আমি ছাড়া দেখতে পায়নি কেউ। শুধ আমি-ই। কিন্তু কেমনভাবে হেসেছিলে তুমি? একটু দেখাও প্লিজ। পূজোর দিন সকালে অঞ্জলি দিয়ে এসে দাঁড়াতাম বারান্দায়। গ্রিলে ঘেরাবারান্দা। ওখান থেকে ঘুড়ি ওড়ানো দেখতাম সকলের। নকশাকাটা ঘুড়িগুলো আকাশে উড়ত পত্‌পত্‌ করে। কাটা ঘুড়িগুলো অসহায় ভাবে উড়ে চলত কোন নীল অজানায়। পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তে। ওদের ধরতে পারতাম না আমি। আমাদের বাড়িতে কাজ করত বিন্দুমাসী। ওর ছোট ছেলেটা একটা লম্বা স গাছের ডাল নিয়ে ঘুড়ির পিছনে ছুটে বেড়াত অনবরত। এপাড়া থেকে ওপাড়া। ওর পিঠে ঝোলানো দু'তিনটে ঘুড়ি। সবসময়। ওকে দেখে আমার হিংসে হত খুব। ইস্! যদি বিন্দুমাসীর ছেলে হতাম?

সত্যিই যদি তুমি বিন্দুমাসীর ছেলে হতে রাকা? তোমার অস্তিত্ব নিয়ে কেউ কি প্রশ্ন তুলত কখনও? হয়ত বা স্রেফ কথার কথাই—। তোমার আড়ালে কেউ বলত কী অমন বাপের ছেলে এভাবে বয়ে গেল! ছিঃ—ছিঃ। তুমি ভাবতে থাকো রাকা। ছেদোকথা গায়ে মেখো না।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতাম আকাশের দিকে। উপর দিয়ে উড়ে যেত কাটা ঘুড়ি। অনেক। ধরতে পারতাম না একটাও। ঘুড়ির বায়না করলেই বাবা ধমক দিতেন। কড়া গলায়। — 'রাকা তুমি ছোটলোকের ছেলে নও। ভদ্রলোকের ছেলেরা কখনও ঘুড়ি ওড়ায় না।'

তুমি কী অত সহজেই ছেড়ে দিতে রাকা? পাল্টা প্রশ্ন করতে ফের।

— একটা দিন ঘুড়ি ওড়ালে কী হয়? সবাই তো ওড়ায়।

— আঃ, রাকা, তুমি বায়না কোরো নাতো একদম। সকলের সঙ্গে তুলনা আমি পছন্দ করি না। মনে রাখবে তুমি ছোটলোকের ছেলে নও।

বাবা গম্ভীর হয়ে যেতেন আরও। জানি বাবা যেটা একবার না বলবেন সেটাতে রাজী হবেন না কিছুতেই। বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইত মন। প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হত খুব। আমি 'ভদ্দরলোক' হতে চাই না। ছোটলোকই হতে চাই। ঘুড়ি ওড়াতে চাই। ওদের মতো। ঘুরে বেড়াতে চাই। বিন্দুমাসীর ছেলে পল্টনের মতো। অথচ —। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি কাঁদতাম। চুপচাপ। একলা।

তুমি কাঁদতে রাকা। অথচ তোমার কান্না টের পেত না কেউ? কেন তোমার চোখ দিয়ে জল ঝরত না একটুও? কেন? ওই বয়সেই কি তুমি শুকিয়ে ফেলেছ সব জল? কীভাবে? তুমি কেমনভাবে প্রতিবাদ করতে চাইতে রাকা? তোমার সে ভাষা

কী বলবে একটু ?

গ্রিলে ঘেরা বারান্দায় দাঁড়ালে নজর পড়ত অমিতদের ছাদ। সরস্বতীপূজার দিন সকালে ছাদে উঠত ওরা। অমিতের বাবা, মা, বোন সকলে। অমিতের বাবা ঘুড়ি ওড়াতেন। অমিতের চোখে একটা রোদ চশমা লাগিয়ে লাটাই ধরে থাকত আকাশের দিকে তাকিয়ে। তখন ভাবতাম একজোড়া ডানা থাকলেই উড়ে যেতাম অমিতদের ছাদে। ঘুড়ি ওড়াতাম। বা চুপ করেই গিয়ে বসতাম লীনার পাশে। ওকে দেখতাম। কী দান দেখতে ও। ফর্সা টুকটুকে গায়ের রঙ। ফুলো ফুলো গাল দুটো। ঈষৎ রক্তাভ। কাজল টানা দু'চোখ। কী সুন্দর! ওর কথা বলার ধরনও। ঠিক যেন রূপকথার গল্পে পড়া কোনো রূপসী রাজকন্যা। কিংবা ফুলের বনে কালো ভ্রমর। নামটাও বেশ পছন্দের। শালিনী।

তুমি লীনার কথাই ভাবতে তাহলে? ওর রূপ, ওর কথা বলা এসবই কি দেখতে তুমি? তোমার মনেও কি তবে প্রেম জেগেছিল একটু? ওই বয়সেই তুমি শিখেছিলে ভালবাসা? কিন্তু কী করে? তুমি বলো। শব্দটার মানে বোঝো তুমি?

অমিতদের কথা ভাবতাম। অমিতরা ঘুড়ি ওড়ায়। অথচ ওরা ছোটলোক নয়। বড়লোক। ভদ্রলোক। অমিতের বাবা একজন বড় ডাক্তার। খুব নাম। প্রতিদিন কত লোক আসে ওদের বাড়ি। কত ধরনের রোগী। ডাক্তারদের পড়াশোনা করতে হয় অনেক। কিন্তু বাবা যে বলেন যারা পড়াশোনা করে তারা কখনো ঘুড়ি ওড়ায় না। কিন্তু অমিতের বাবা? অমিতও পড়াশোনায় খুব ভাল। ইংরেজী স্কুলে পড়েও। ফটাফট্ কথাও বলে ইংরেজীতে। প্রত্যেক বছর স্ট্যাণ্ড করেও। কত প্রাইজ পায়! তাহলে বাবা যে বলেন —! না, বাবা কিস্যু জানেন না। কিস্যু না।

মা'র সঙ্গে মাঝে মধ্যে যেতাম অমিতদের বাড়ি। অমিতের মা আমার মায়ের বান্ধবী। একই সঙ্গে কলেজে পড়েছিল দু'জনে। অমিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল আমার লীনাও খেলত। দামী দামী খেলার সরঞ্জাম ছিল ওদের। শো-কেশ ভরা পুতুল। এমনকী ভিডিও গেমও। অমিতকেভালোবাসত সকলে। লীনাকেও। অমিত সবচাইতে বেশি নম্বর পেত অঙ্কে। কখনো কখনো ফুল মার্কসও। আমি অঙ্কে ভাল নম্বর পাইনি কোনোদিন। অঙ্ক যে আমার। ভালই লাগত না একেবারে। ধাঁধার মতো মনে হত। মনে মনে অমিতকে ঈর্ষা করতাম আমি। খুব-ই। ওদের ঐ দামী জিনিসগুলোর উপর তোমার লোভ ছিল রাকা? ওদের ঐ ভিডিও গেমটাকে ভেঙ্গে দিতে তোমার কি ইচ্ছা হয়নি কখনও? কিন্তু কেন রাকা? তোমার বাবা একজন ছাপোষা কেরাণী। একথা মনে থাকত না তোমার? তাই কি তুমি কষ্ট পেতে? ওদের সঙ্গে যে ফারাক বিস্তর। একথা কেন মানতে চাইতে না তুমি? এখন জানাবে কি?

তখন আমার গোঁফের রেখা উঠতে শু করেছে সবেমাত্র। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখটাকে দেখতাম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। অনেকক্ষণ ধরেই। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় সমবয়সী মেয়েদের দিকেও তাকাতাম। আড়চোখে। অদ্ভুত কোনো এক আকর্ষণই অনুভব করতাম যেন। ভালোও লাগত। আদর করতে ইচ্ছা হত খুব। শুয়ে শুয়ে ওর কথা ভেবেছি অনেকরাত। হয়ত বা স্বপ্নেও। কল্পনার রঙীন ফানুসে চেপে লীনাকে সঙ্গে নিয়ে উড়ে বেড়াতাম আমি। লীনা জানত না।

স্বপ্ন যে তুমি বড় বেশিই দেখতে রাকা। এলোমেলো। লাগামছাড়া গোছের সেসব। তাই কি অঙ্কে ভাল নম্বর পাওনি কোনোদিন? কিন্তু তাই বলে অমিতকে ঈর্ষা করতে কেন? ওতো কোনদিন তোমাকে —? তোমার স্বপ্ন অলীক। তাই তুমি কল্পনাও করতে পারনি, স্বপ্নপূরণের ব্যর্থতাই তোমাকে ঘিরে ধরবে একদিন। অথচ —!

স্কুলে আমার পাশে বসত সায়ন। ওই আমাকে শেখাত অনেককিছু। অনেক অসভ্য অসভ্য কথা বলত ও। পাড়ার কোন এক দাদা-ই নাকি ওকে বলত এসব। ওর কথা শুনে মাঝে মাঝে লজ্জা করত কেমন। রোমাঞ্চও হত। অজানা সব রহস্য জানার রোমাঞ্চ।

৭ই মাঘ, রাত্রি ঃ কাল সরস্বতী পূজা। শুত্রবার। ৮ই মাঘ।

গত পরশু মৃত্যুদিন গেছে বাবার। এর মধ্যেই কেটে গেল ন'টা বছর। দ্রুত। মনেই হয় না। এই সেদিনের ঘটনাই যেন। অন্ধকারে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে বাবার আচমকাই পড়ে যাওয়া। হুড়মুড়িয়ে। কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে। উপর থেকে নিচে। যন্ত্রণায় খুব জোরে কঁকিয়ে ওঠে। হয়ত বা ভয়েই। চোট পেয়েছিলেন মাথায়। কোমরেও। প্রচণ্ড। হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময়ও বলতে চেয়েছিলেন কি যেন। হাতের ইশারায়। হয়ত বা আমাকেই —। জ্ঞান হারিয়ে ছিলেন তারপরই। আমাকে মানুষ করে তুলতে চেয়েছিলেন বাবা।

জ্ঞানপাপীর মতোই যে কথা বলছ রাকা। সেই মানুষটার কথা তোমার মনে পড়ে একটুও? তিনি তো মানুষই করতে

চেয়েছিলেন তোমাকে। এমনকী শেষ মুহূর্তেও-। অথচ তুমি? মনে পড়ে শেষ মুহূর্তেও তোমার বাবার স্বপ্ন? তোমাকে ঘিরেই তাঁর সেই ইচ্ছার কোনো মূল্য দিয়েছ তুমি?.. প্রতিশোধ? প্রতিশোধের কথাই কি মনে হয়েছে তোমার? সে লোকটা হয়ত একদিন তোমার স্বাভাবিক ইচ্ছাগুলোকে হত্যা করেছিল, সুযোগ বুঝে তুমিও কি —! তোমার হাত দুটো কাঁপেনি একটুও? তুমি কি পাষাণ হয়ে গেছ রাকা?

বাবার আকস্মিক মৃত্যু মা মেনে নিতে পারেনি সহজে। আঘাত পেয়েছিল খুব। স্বাভাবিক ষোলো বছরের অবিচ্ছেদ্য একটা সম্পর্ক মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। তার চেয়েও বেশি কিছু। দু'দিন অচৈতন্যের মতো পড়েছিল বিছানায়। তারপর থেকেই সামান্য গন্ডগোল হয়ে গেল মাথার। চিকিৎসায় ফল হয়নি কোনো। বিড় বিড় করে বকে সারাদিন।

মা কাকার কাছে এখন। চন্দননগর। কাকা-ই নিয়ে গিয়েছিল জোর করে। আমার উপর আস্থা রাখতে পারেনি হয়ত। আমাকেও যেতে বলেছিল অবশ্য। আমি যাইনি। মুক্তির এত বড় সুযোগ আমি ছাড়ব কেন?

এখন রাত অনেক। নিস্তব্ধ চারদিক। আশপাশের বাড়িগুলোয় নিভতে থাকা আলো। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়া পুরো শহর। স্তব্ধতা ভেঙ্গে সবেগে ছুটে যাওয়া ট্রেন। ট্রেনের হুইসেল। ইঞ্জিনের শব্দ। মিলিয়ে যেতে থাকা ক্রমশ। গাঢ় অন্ধকারের বুকে এঁটে থাকা অসংখ্য জ্বলন্ত বিন্দু। স্থির। দলা পাকানো মেঘের ভেসে যেতে থাকা। জেগে থাকা পোস্টের মৃদু আলো। আলোর বিচ্ছুরণ। রাত জাগা পাখি। সারা আকাশ জুড়ে হুটোপুটি। ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে যাওয়া। দূরের দু'তিনটে কুকুরের ডেকে ওঠা একসঙ্গে।

বাড়ির সামনে সেই ছোট জমি আর নেই। বাড়ি উঠে গেছে অনেকদিন। বাবার কথা মনে পড়ছে খুব। সেই ঘুড়ির স্বপ্ন-ও। বাবার মুখ। হাসপাতালের বিছানায় সংজ্ঞাহীন বাবার অনড় দেহ। নল বেয়ে নামতে থাকা স্যালাইন-ওয়াটার। রক্ত। ও. টি. তে নিয়ে যাবার সময় বাবার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া মা। মা'র অস্থির মূর্তি। তিন রাত সময় দিয়েছিলেন ডাক্তার। বাহাত্তর ঘন্টা। আড়াই দিনের মাথায়ই—

তুমি কি কাঁদছ রাকা? তা না হলে তোমার চোখ দিয়ে জল ঝরছে কেন? অশ্রু? তুমি কাঁদ এখনও? তোমার অশ্রু মুছে যায়নি তাহলে? যে লোকটার উপর তুমি প্রতিশোধ নিয়েছ সব চাইতে বেশি; যার স্বপ্নকে করেছ ক্ষতবিক্ষত; তার কথা এখনও মনে পড়ে তোমার? নাকি তোমারই অজান্তে--!

কারা যেন কথা বলছে ফিসফিসিয়ে। কাছেই কোথাও। ক্ষীণ একটা শব্দ। পাড়ারই কোনো ছেলে। বা ছেলের দল। হয়ত বা রাত জাগবে প্যান্ডেলে। মাঞ্জাও দিতে পারে।

নিজের কথাই কি আমি ভেবে চলেছি আমি? আমি বেকার। পড়াশোনার পাট চুকেছে অনেকদিন। এখন বসেই আছি। আমি ফালতু একটা। হোপলেস। আড়ালে এসব কথাই বলে সকলে। বলে আনন্দ পায় হয়ত। চাকর জন্য নয়। সেরকম ভাবে চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। আসলে বেঁচে থাকার কথা মনেই হয়নি কখনও। যেরকম খুশি কাটিয়ে দেওয়া জীবনটাকে। মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়ানো দেশ, মহাদেশ, সাগর নদী রাস্তায়। কিংবা জঙ্গলেও। বিন্দুমাসীর ছেলে পল্টুকেই আদর্শ হিসাবে দাঁড় করিয়েছিলাম একদিন।

লীনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিন। একেবারে মুখোমুখি। ঘোষপল্লীর মোড়ে। ওর বিয়েতে আমি যাইনি। এর সঠিক কারণ আমারও অজানা। চেনাশোনা কাউকে দেখলেই এখন আড়াল করি নিজেকে। লুকিয়ে বাঁচতে চাই। সেদিন চেষ্টা করেও পারিনি। হঠাৎ-ই যেন সামনে এসে গিয়েছিল ও। এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও ওর মুখে মৃদু হাসি। হয়ত আমাকে জিজ্ঞাসা করতই লীনা 'তুমি কেমন আছ রাকাদা?' ওকে আমি দিইনি সে সুযোগ।

জীবনে এত ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে তুমি কী করে বেঁচে আছ রাকা? তোমার জীবনে একটা বড় প্রাপ্তি কী জান?..... একটা বড় ধরণের ফাঁকি। এক বিশাল শূন্য। তা বলে তোমার জীবনবোধ এত ভঙ্গুর? এত ঠুনকো? তুমি যে বড় গলায় বলেছিলে, পালিয়ে বাঁচা যায় না, সত্যের মুখোমুখি হতেই হবে একদিন। তাহলে আজ কেন তুমি—? তোমাকে 'কাপুষ' বললে তুমি রাগ করবে রাকা?

৮ই মাঘ, প্রভাত ঃ ভোর।

কুয়াশা ঢেকে আছে চারিদিক। জড়িয়ে থাকা শহরের বুকে। গভীর স্নেহ! দূরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা সুপারী গাছের মাথাগুলো অস্পষ্টকেমন। ধোঁয়াশা। টবে ফুটে থাকা ডালিয়া। ডালিয়ায় লেপ্টে থাকা শিশির। ফুরফুরে শীতল হাওয়া ধ

াক্কা মারছে শরীরে। অব্যক্ত এক শান্তির শিহরণ। বা মুক্ত জীবনেরই উল্লাস। যেন ছড়িয়েই যেতে বাতাসে।
পাড়ার পূজা মন্ডপে মাইক। তীব্র জোরে হিন্দী গান। র‍্যাপ। পাশের কোনো বাড়ি থেকে ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। উলুধ্বনি। বাবা মারা যাবার পর পূজার পাট চুকে গেছে বাড়ীতে। অঞ্জলিও দেওয়া হয় না সেই থেকে। দিয়ে কী লাভ!
পাড়ার উঠতি ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে নেমে পড়েছে রাস্তায়, সেজেগুজে। ওদের ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা চিলতে হাসি। চোখের চাউনিতে কোনো ইঙ্গিত। একটু যেন উগ্র। বা নির্ভীকতা । লাটাই ঘুড়ি হাতে দুটো ছেলে চলে গেল সামনে দিয়ে, জং ধরা গ্রিলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি আমি। ওদের দেখে ঘুড়ি ওড়াতে ইচ্ছা হল খুব। হঠাৎ-ই। আর কেনই বা হল কে জানে! এরকম ইচ্ছা হত সেই ছোটবেলায়। তখন পারিনি। এখন কিন্তু পারি। ইচ্ছা করলেই। এখন আমি মুক্ত। কেউ বাধা দেয় না আমাকে। কেউ নেই-ও।
সত্যিই কি তুমি ঘুড়ি ওড়াবার কথা ভাবছ রাকা? কিন্তু—। সব কিছুই কি অত সহজ? তাই কি মনে করো তুমি? যাই হোক, তোমার ইচ্ছাগুলো সব মরে যায়নি তাহলে? এখনও বেঁচে আছে? নাকি পঙ্গু হয়েই পড়ে আছে সেগুলো? তোমার কামনাগুলিকে কি নতুন করেই খুঁচিয়ে জাগাতে চাও তুমি? .....তুমি জাগাও।
কয়েকটা টাকা পকেটে। একজনের কাছ থেকে ধার করেছি গতকাল। বেরিয়ে পড়লাম। পাড়ার মোড়েই ঘুড়ির দোকান। দোকানের সামনে ঝুলতে থাকা লাটাই ঘুড়ি। হলুদ সুতো সমেত লাটাই কিনে ফেললাম একটা। কয়েকটা ঘুড়িও। সাদা-কালো রঙের পঙ্খী ঘুড়ি। অথচ আমার ক্ষিদে পাচ্ছে খুব।
লাটাই ঘুড়ি হাতে উঠে এলাম ছাদে। চারদিকে ঘুড়ি উড়ছে প্রচুর। প্রায় সব বাড়ির ছাদেই ছেলের দল। মেয়েও। ভাগাভাগি করে নেওয়া উৎসবের মেজাজ। হামির ঝলক। অমিতদের বাড়ির দিকে নজর পড়ল হঠাৎ। একটা নিমগাছ বেড়ে উঠেছে মাঝখানে। ডালপালা নিজের অধিকার বিস্তর করছে ক্রমশ।
ঘুড়ি ওড়াচ্ছে অমিত। বোধহয় নেশা ছাড়তে পারেনি এখনও। বিশাল মাইনের চাকরীতে জয়েন করার পর জৌলুস ফিরেছে চেহারায়। ছোটবেলায় রোগা ছিল। ওর পাশেই লীনা। ওর বাবা-ও। ওরা এখন এখানেই। হালকা বেগুনী শাড়ি জড়িয়ে লীনা। আগের থেকেযেন আরও বেশি সুন্দরী হয়েছে ও। ওর চোখ দুটোও। অদৃশ্য কোনো এক গভীরতা। যেন ছুঁয়েই থাকে সবসময়। এখনও ডুবে যেতে পারি আমি।
তুমি ডুবে যাওয়ার কথা ভাবছ রাকা? লুকিয়ে লুকিয়ে পরস্ত্রীর দিকে তাকাতে লজ্জা করে না তোমার? নাকি সেসবও হারিয়ে বসে আছে অনেকদিন? ..... প্রেম? শব্দটা তোমার মুখে বড়ই বেমানান। তুমি তো নিজেকেই ভালোবাসনি কোনোদিন। তাহলে অপরকে ভালোবাসবে কী করে? জীবন থেকে পালিয়ে ভালোবাসা চাও তুমি? সেটা হবে না কখনও। এবার ভালোবাসা খুঁজে বেড়াও তুমি।
কোনোরকমে কল খাটালাম একটা ঘুড়িতে। লাটাইয়ের সঙ্গে বাঁধলাম। সুতোয় হ্যাঁচকা টান মারার সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়িটা উড়ল কিছুটা। সামলাতে পারলাম না। গোঁত্তা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল নিচে। কার্ণিশে। ঠক্ করে শব্দ হল একটা। চেষ্টা করলাম আবার। আবার-ও। মাথার দিক থেকে ঘুড়িটা ফেঁসে গেল কিছুটা। রাগ হল প্রচন্ড। দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে দিলাম ঘুড়িটাকে।
এবার আরেকটা।
অল্প চেষ্টাতেই উড়ল দ্বিতীয় ঘুড়ি। উপরে। মানে আকাশেই। হাওয়া লেগে ঘুড়িটা উড়ে যাচ্ছে শূন্যে। নিমগাছ পেরিয়ে অমিতদের ছাদের দিকেই। দ্রুত। লাটাইটা বন্-বন্ করে ঘুরছে হাতে। আকস্মিকতার উন্মাদনায় অদ্ভুত এক অনুভূতিই যেন বইছে শরীরে। ঘুড়িটা ওদের মাথার উপর উড়ে যেতেই অমিত দেখল আমাকে। পিছন ঘুরে লীনাও। ওরা কি অবাক হয়েছে একটু? লাটাইটা থামাতে পারছি না কিছুতেই। ঘুড়িটা উড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। অমিতের ঘুড়ির কাছেই আমারটা। প্যাঁচ খেলব। ওকে আমি হারাতে পারিনি কোনোদিন। ঘুড়ির খেলায় ওকে হারাবো। লীনার সামনেই।
নিজের ব্যর্থতার দায় কি তুমি অন্যের কাঁধে চাপাতে চাও রাকা? তা না হলে অমিতকে কেন এখনও হিংসে কর তুমি? কেনই বা লীনাকে — ? স্বপ্নপূরণের ব্যর্থতা তোমাকেই যে গায়ে মাখতে হবে রাকা। তুমি কি ভয় পেলে?
প্যাঁচ লেগে গেল। অমিতের ঘুড়ির সঙ্গেই। কীভাবে প্যাঁচ খেলব জানি না। প্রাণপণে সুতো টানছি শুধু। লাটাইটা পড়ে গেল হাত থেকে। গড়িয়ে গেল। ভেঙ্গেই গেল বোধহয়। যাক। ধারালো সুতো কেটে গেছে আঙুলে। যাচ্ছেও। গল্‌গল্

করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। তবুও সুতো টেনে যাচ্ছি আমি। তবুও। চোয়াল শক্ত হয়ে গেল আমার। মনে হল স্বপ্নের সেই ঘুড়িটাই —

প্রথমে বুঝতে পারিনি ঠিক। হাতে ধরা সুতোটা আল্‌গা হয়ে গেল হঠাৎ। এলিয়ে পড়ল নিমগাছের মাথায়। অমিতের ঘুড়িটা স্থির হয়ে ঝুলছে আকাশে। হাততালি দিয়ে উঠল লীনা। এদিক ফিরে হাত নাড়ল একবার। আমাকে কি ছু বলতে চ াইল হয়ত। দুয়ো? ওর বরও দেখছে আমাকে। আমি নির্বাক। চাপা কান্নাই যেন গুমরে উঠতে চাইছে ভিতর থেকে। চে াখে জল আসছে না যদিও। যেন শক্ত বরফই হয়ে গেছে সব জল। বা বাষ্প হয়েই উড়ে গেছে কোথাও। প্রচন্ড লজ্জায় কুঁকড়ে গেছি আমি। মনে হল লাফিয়ে পড়ি ছাদ থেকে। নীচে। খোয়া ভরা রাস্তায়। ছিন্নভিন্ন করে দিই নিজেকে। নিজের দুর্বল অস্তিত্বও। ওই অবস্থায় লীনা দেখুক আমাকে। একেবারে ছাদের ধারে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লাম। নিচের দিকে তাক াতে মাথার ভিতরটা দুলে উঠল কেমন। যেন কেঁপেই গেল সারা শরীর। বসে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গেই। ভয়ে। মনে হল কি যেন। পিছনে তাকালাম একবার। হঠাৎ-ই। কৌতূহলে। নিমগাছের ফাঁক দিয়েই দেখতে পেলাম পরিষ্কার। স্পষ্ট-ই। ঘুড়ি ওড়াবার আনন্দেই লীনা মাতোয়ারা।

এবারে তুমি কী করবে রাকা?



সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com